শিশুদের ইতিবাচক মনোজগৎ

শিশুদের জীবন শুরু হয় তাদের পরিবার এবং পরিচর্যাকারীদের ঘিরে। তাই, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশও নির্ভর করে এসব ব্যক্তির ওপর; তারা বাচ্চাদের সাথে কীভাবে কথা বলে, খেলাধূলা করে, গৃহস্থালীর কাজ কীভাবে পরিচালিত হয়, তার ওপর। জন্মের পর থেকেই শিশুরা যেহেতু একটি সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠতে থাকে তাই তারা চারপাশের আবেগীয় সম্পর্কের ব্যাপারে ভীষণ স্পর্শকাতর হয়। এমনকি যখন বাচ্চারা তাদের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতিগুলো অন্যদের বলে বুঝাতে পারে না তখন পরোক্ষভাবে হলেও আবেগ-অনুভূতিগুলো প্রকাশ করে। যেমন, খেলাধূলা, ছবি আঁকা, স্বপ্নের মাধ্যমে নেতিবাচক আবেগগুলো প্রকাশিত হয়।

অনেক সময় আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা থাকে যে সাত/আট বছর বয়সের নীচে যেসব শিশু, তারা যেহেতু খুব ছোট তাই চারপাশের ঘটনাগুলো ভালোভাবে বুঝে না, সেগুলো তাদের খুব একটা প্রভাবিত করে না। পরিবারে কোন কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটলে কেউ তা নিয়ে বাচ্চাদের সাথে আলাপ করার প্রয়োজন বোধ করে না, কোন ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই বাচ্চাদের সব কিছু থেকে সরিয়ে রাখা হয়। যেমন, পরিবারের কেউ চলে গেলে অথবা প্রিয় মানুষটির মৃত্যু হলে, বাচ্চাদেরকে কোন কিছু জানানো হয় না। আবার, অনেক সময় শিশুদের কাছে মিথ্যা বলা হয়। কারণ, ওরা তো বুঝবে না। এই ব্যাপারগুলো ছোট শিশুদের মনে ভীষণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাদের মনে বড়দের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়।

বাড়িতে বাবা-মা এবং সন্তানদের মাঝে সাধারণতঃ যেসব কারণে দ্বন্দ্ব হয় তা হচ্ছে:

প্রতিযোগিতা-পরায়ণ মনোভাব: বাড়িতে একাধিক সন্তান থাকলে দেখা যায়, যদি একটি বাচ্চা শান্ত-শিষ্ট এবং লেখাপড়ায় ভালো হয় তখন বাবা-মা তার সাথে অন্য বাচ্চার তুলনা করতে থাকেন। আবার, অনেক সময় কাজিন বা বন্ধুদের সাথেও শিশুটির তুলনা করা হয়, তাকে ছোট করে দেখা হয়। এই প্রতিযোগিতা-পরায়ণ মনোভাব শিশুদের মাঝে প্রায়ই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে সেটা তাদের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। শিশুটির সবকিছু স্বাভাবিক হলেও, প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে তাদের মাঝে কিছু সমস্যা তৈরি হয়। প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, আগ্রহ এবং পছন্দ আলাদা-আলাদা। তাই, তাদের পছন্দ এবং আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুযায়ী তাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে।

অনেক সময় আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা থাকে যে সাত/আট বছর বয়সের নীচে যেসব শিশু, তারা যেহেতু খুব ছোট তাই চারপাশের ঘটনাগুলো ভালোভাবে বুঝে না, সেগুলো তাদের খুব একটা প্রভাবিত করে না। পরিবারে কোন কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটলে কেউ তা নিয়ে বাচ্চাদের সাথে আলাপ করার প্রয়োজন বোধ করে না, কোন ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই বাচ্চাদের সব কিছু থেকে সরিয়ে রাখা হয়।

পর্যাপ্ত যোগাযোগের অভাব: মনোযোগ দিয়ে শিশুর সব কথা শোনা প্রয়োজন। এতে বাবা-মা এবং সন্তানের মাঝে যেমন ভালোবাসার আদান-প্রদান হয় তেমনি শিশুরাও তাদের সবরকম ইচ্ছা এবং চাওয়া-পাওয়া বাবা-মার কাছে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। সব সময় বাবা-মার সাথে মন খুলে কথা বলতে উৎসাহিত করা হলে, তাদের মধ্যে সামাজিক পরিবেশে কথা বলার ভয় দূর হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনার সময় শিশুর শারীরিক অঙ্গভঙ্গির প্রতি খেয়াল করা দরকার। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শিশুর আবেগের মাত্রাও প্রকাশ পায়। তাই, শিশুদের অবাচনিক যোগাযোগের দিকে সব সময় খেয়াল রাখা দরকার।

আবেগ বহিঃপ্রকাশের অপ্রতুলতা: বাবা-মা সন্তানের কাছে আদর্শ-স্বরূপ। তাই, বাবা-মাকে সব সময় দৃঢ়তার সাথে এবং সঠিকভাবে আবেগের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাবা-মাকে রাগের আক্রমণাত্মক বহিঃপ্রকাশ এড়িয়ে যেতে হবে। যখন বাবা-মা রাগের সময় নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তখন বাচ্চারাও এটা দেখে শেখে। আবার, নেতিবাচক আবেগগুলো প্রকাশ না করে চেপে রাখাটাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাই, বাড়িতেই নেতিবাচক আবেগগুলো গঠনমূলকভাবে প্রকাশ করার অনুশীলন করা ভালো।

কঠোর অনুশাসন: বাসার নিয়ম-কানুন অতিরিক্ত কঠোর হলে শিশুরা সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। খুব বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব শিশুদের মাঝে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই, পরিবারের সব কিছু যেমন নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকা ভালো তেমনি নিয়ম-কানুনের মধ্যে কিছু নমনীয়তা বজায় রাখাও দরকার।

বাড়ির পরিবেশ যেন ইতিবাচক থাকে: বাবা-মা যেহেতু সন্তানদের প্রথম শিক্ষক, নির্দেশক, উপদেশ প্রদানকারী এবং রোল মডেল তাই বাড়ির পরিবেশ থাকা চাই সুস্থ, সুন্দর ও ইতিবাচক। বাড়ির পরিবেশে যদি থাকে উষ্ণতা, ধৈর্য্য, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা, সম্পর্কে যদি থাকে গভীরতা তাহলে শিশুরা অনেক নিরাপদ বোধ করে এবং স্কুলের পরিবেশেও তারা ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারে। বাব-মার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও শিশুর জন্য আলাদা করে কিছুটা সময় রাখা জরুরি, তাদের কথা শোনা এবং বুঝার জন্য।

- প্রতিটি শিশুর সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। প্রতিটি শিশুই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিকশিত হয়। তাই, তাদের প্রয়োজনও হয় বিভিন্ন রকম।
- বাবা-মাকে শিশুর ছোটখাটো বিষয় বা সমস্যাগুলো শোনার জন্য সময় দিতে হবে। তাহলে, বড় কোন বিষয় বা সমস্যা দেখা দিলেও, সহজেই তারা বাবা-মাকে বলতে পারবে।
- শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিও আগ্রহ দেখানো দরকার। একজন রোল মডেল হিসেবে যখন শিশুদের প্রচেষ্টা এবং আগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন শিশুরা আরো বেশি অনুপ্রাণিত বোধ করে।
- এটা মনে রাখা দরকার, শিশুরা সব সময় বড়দের আচরণ অনুকরণ করে। তাই, বাড়ির পরিবেশ যেন এমন থাকে যেখান থেকে শিশুরা ভালো কিছু শিখতে পারে।
- পরিবারের সবাই একসাথে খাওয়া-দাওয়া করার নিয়ম মেনে চলতে পারলে ভালো। এতে পরিবারের সকলের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।
- নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সময় যেন টিভি দেখা, মোবাইল ফোনে গল্প করা ইত্যাদি না থাকে। এগুলো নিজেদের আলাপ-আলোচনাতে যেন বিঘ্ন ঘটাতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখা দরকার।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসের আবহ গড়ে তোলা খুব দরকার। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বসমূহ শিশুদের থেকে দূরে রাখাই ভালো। শিশুরা যখন বাবা-মাকে তর্ক-বিতর্ক করতে দেখে তখন তারা ভীত হয়ে পড়ে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
- সপ্তাহে একদিন পারিবারিক মিটিং-এর জন্য বরাদ্দ রাখা দরকার। একসাথে সময় অতিবাহিত করার মাধ্যমে একে অন্যকে যেমন জানতে পারবে তেমনি সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আর কী কী করণীয় তাও পরিষ্কার বুঝা যাবে।

তাই, যদি একটি সুস্থ, সুন্দর ইতিবাচক পরিবেশে শিশুটি বেড়ে উঠতে পারে তাহলে হয়তো পরবর্তীতে অনেক জটিলতাই আর সৃষ্টি হবে না ।

বাড়ির পরিবেশে যদি থাকে উষ্ণতা, ধৈর্য্য, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা, সম্পর্কে যদি থাকে গভীরতা তাহলে শিশুরা অনেক নিরাপদ বোধ করে এবং স্কুলের পরিবেশেও তারা ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারে। বাব-মার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও শিশুর জন্য আলাদা করে কিছুটা সময় রাখা জরুরি, তাদের কথা শোনা এবং বুঝার জন্য।

হাজেরা খাতুন
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট